International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-III, November 2014, Page No. 9-17
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

মেঘ বলেছে যাব যাব : অন্তরঙ্গ পাঠ

ডঃ গৌতম কুমার নাগ

সহযোগী অধ্যাপক (ফরাসি) ও বিভাগীয় প্রধান, বিদেশি ভাষা বিভাগ,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The aim of the present paper is to analyze the salient linguistic features of a popular song of Tagore: megh boleche jabo jabo .It should be noted that this study is confined only to the poetic aspect of the song; the musical aspect is excluded. We have interpreted this song as a poetic creation based on the underlying theme of union of the finite and the infinite --- a major theme in the universe of Tagorean thought. This song implicitly suggests the attainment of a state of enlightment where the dividing line between joy and sorrow, finite and infinite, life and death is blurred. We have attempted to bring out the hidden message by reading between the lines and carrying out an in depth study of the constituent elements of the song at various levels: lexical, morpho-syntactic and semantic.

Key Words**: **finite, infinite, Tagorean thought, union, dividing line

এই নিবন্ধটি একটি সুপরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ : মেঘ বলেছে যাব যাব (পর্যায় : পূজা)। এর সাঙ্গীতিক রূপটি নয়, আমাদের আলোচ্য এর কাব্যরূপটি। এই গানের কাব্য অবয়বের সৌন্দর্য আস্বাদনের লক্ষ্যে আমরা এর বিভিন্ন গঠক উপাদানের বিশ্লেষণ করব : শব্দচয়ন, পদসমূহের পারস্পরিক অন্বয়, বাক্যের গঠনকৌশল, বিভিন্ন ব্যাকরণগত উপাদানের ব্যবহার। কথাবস্তুর পর্যালোচনার সঙ্গে আমরা এই গানে না বলা বাণীর ব্যঞ্জনাটুকু অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

মেঘ বলেছে 'যাব যাব', রাত বলেছে 'যাই',
সাগর বলে 'কূল মিলেছে --- আমি তো আর নাই'।
দুঃখ বলে 'রইনু চুপে তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে',
আমি বলে 'মিলাই আমি আর কিছু না চাই'।।
ভুবন বলে 'তোমার তরে আছে বরণমালা',
গগন বলে 'তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা'।।
প্রেম বলে যে 'যুগে যুগে তোমার লাগি আছি জেগে,'
মরণ বলে 'আমি তোমার জীবনতরী বাই'।।[১]

প্রাথমিক পাঠেই এই গানের কাব্য অবয়বের একটা নির্মাণকৌশল সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। প্রতিটি বাক্যই একটি প্রধান খন্ডবাক্য (principal clause) ও একটি আশ্রিত খণ্ডবাক্যে (subordinate clause) গঠিত। আশ্রিত খণ্ডবাক্যটি একটি প্রত্যক্ষ উক্তি। গঠনকৌশলটি এইভাবে উপস্থাপন করা যায় :

প্রধান খণ্ডবাক্য	আশ্রিত খণ্ডবাক্য
কর্তা + সমাপিকা ক্রিয়া	প্রত্যক্ষ উক্তি

দেখা যাচ্ছে প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্ষেত্রে 'বলা' ক্রিয়ার একাধিত্য। শুধু একই ক্রিয়ার পৌনঃপৌনিক প্রয়োগেই নয় আর একটি যোগসূত্র ধরা পড়ে উক্ত ক্রিয়ার কালরূপের ব্যবহারে। আটকলিবিশিষ্ট এই গানটির প্রথম কলিটি বাদ দিলে প্রতিটি কলিতেই ক্রিয়াপদের সাধারণ বর্তমানের রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে। শুধুমাত্র প্রথম কলিতেই ওই ক্রিয়ার পুরাঘটিত বর্তমানের রূপটি প্রযুক্ত হয়েছে। প্রথম কলিটি আরেক দিক থেকেও ব্যতিক্রমী চরিত্রের। পরবর্তী সাতটি কলির প্রত্যেকটি একটিমাত্র বাক্যে গঠিত ; "বলা" ক্রিয়াটির ব্যবহার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাই শুধু একবার। প্রথম কলিতেই শুধু দুটি বাক্যের সহাবসস্থান; এই কলিতে তাই "বলা' ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি। এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব। এই মুহূর্তে যা আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে গানটির একমাত্র ক্রিয়া বা action হল 'বলা'। বাক্যের কর্তারা শুধু কথা বলে। এই গানটি শুধু প্রত্যক্ষ উক্তির সমাহার। এই গানে কবি বাণীর মালা গেঁথেছেন।

এই উক্তিকারীদের ব্যাকরণগত চরিত্র বিশ্লেষণে একটা শ্রেণিবিন্যাস ধরা পড়ে। সমগ্র গানে বিভিন্ন বাক্যে কর্তৃপদসমূহের মধ্যে একটিমাত্র ব্যক্তিবাচক শব্দ : সর্বনাম '"আমি"'। বাকি সবই অব্যক্তিবাচক বা অপ্রাণীবাচক। গানে কর্তৃপদের সংখ্যা নয় : মেঘ, রাত, সাগর, দুঃখ, আমি, ভুবন, গগন, প্রেম, মরণ। এর মধ্যে পর্যায়ক্রম অনুসারে '"আমি"'র আবির্ভাব পঞ্চম স্থানে।

পূর্বে চারটি এবং পরে চারটি কর্তৃপদ --- ''আমি''র অবস্থান গানের কেন্দ্রস্থলে। ''আমি''র এই কেন্দ্রীয় অবস্থানের কোন তাৎপর্য আছে কিনা গানের ভাববস্তুর আলোতে আমরা তার আলোচনা করব।

প্রধান খণ্ডবাক্যের পর এবার অপ্রধান খণ্ডবাক্যের আলোচনায় আসা যাক। উক্তিবাক্যগুলিতে সর্বনামের প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। গানের প্রথম চারটি কলিতে অর্থাৎ স্থায়ী ও অন্তরাতে মধ্যমপুরুষ অনুপস্থিত, পরবর্তী চারটি কলিতে অর্থাৎ সঞ্চারী ও আভোগে প্রতিটি উক্তিতেই মধ্যমপুরুষ উপস্থিত। মধ্যমপুরুষের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুযায়ী এই নিবন্ধটিকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশে বক্তারা শুধু নিজের কথা বলে, অপর কাউকে সম্ভাষণ জানায় না। পরবর্তী অংশে প্রত্যেকে কাউকে সম্ভাষণ করছে। কার বা কাদের উদ্দেশে এই সম্ভাষণ ? এই নিবন্ধে আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব।

আমরা গানের প্রথম অংশের বিশ্লেষণের সূচনা করব উক্তিকারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে। মেঘ ও রাতের চারিত্রিক ঐক্যটি সবচেয়ে সহজে ধরা পড়ে। দুইয়ে মিলে এক নিবিড়, নীরন্ধ্র অন্ধকারের আবহ রচনা করে। মেঘ বা রাতের মত এককভাবে সাগর সৌন্দর্যের অনুষঙ্গবাহী হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু এই ত্রয়ীর সমাবেশ এক অজানা ত্রাসের আবহ সৃষ্টির অনুকূল। মেঘসম্বৃত গহন রাত্রি, অনন্ত সাগর --- সব মিলিয়ে এক বিপদসঙ্কুল অভিযানের সঙ্কেত ফুটে ওঠে। স্থায়ীতে আভাসিত নৈসর্গিক পরিমণ্ডল এক ভিন্নতর মাত্রা লাভ করে এর ঠিক পরে অন্তরার শুরুতেই "দুঃখ"এর আবির্ভাবে। বহিঃপ্রকৃতির সেই চিত্রকল্পগুলি তখন মানবজীবনের দুঃখযন্ত্রণার পর্বের প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠে। দুঃখবেদনার চিত্রায়ণে মেঘ, রাত্রি বা সাগরের রূপকল্পের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। দুঃখরাত, দুঃখসাগর --- এই রূপকগুলি বহুব্যবহারে ম্লান। মেঘ, রাত ও সাগর এই দৃষ্টিকোণ থেকে শুধুই প্রতীক।

প্রকৃতিগতভাবে বিপদের অনুষঙ্গবাহী হলেও মেঘ, রাত বা সাগরের উক্তিতে কিন্তু কোথাও কোন বিপদের ইঙ্গিত নেই, আছে বিপদমুক্তির নিশ্চিত আশ্বাস, শেষে সফল সমাপ্তির ঘোষণা। গানের সূচনা মেঘ ও রাতের বিদায়বাণীতে। প্রথম কলিতে আছে অন্ধকারের অবসানের, প্রথম আলোর উদ্ভাসের আশ্বাস। পরবর্তী কলিতে সাগরের কণ্ঠে এক দীর্ঘ অভিযানের সফল পরিণতির বার্তা। এই উক্তিবাক্যগুলিতে প্রযুক্ত ক্রিয়াপদগুলির কালরূপের মধ্যে যে সুস্পষ্ট রূপরেখা ফুটে ওঠে আমরা এবার তার বিশ্লেষণ করব।

মেঘ ও রাতের পূর্বোল্লিখিত চারিত্রিক ঐক্য ছাড়া তাদের উক্তিবাক্যের গঠনেও নিবিড় ঐক্য ধরা পড়ে। বিদায়ী মেঘ ও রাতের উচ্চারিত বাক্য একটিমাত্র পদে গঠিত : উভয়ক্ষেত্রেই তা হল ক্রিয়াপদ ''যাওয়া''। পার্থক্য সংখ্যায় এবং কালরূপে। প্রথম ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্ত ক্রিয়ার কালরূপ সাধারণ ভবিষ্যৎ। ক্রিয়ার দ্বিত্ব আশ্বাসের দৃঢ়তার আভাস দেয়। কিন্তু এই আশ্বাসের রূপায়ণের মুহূর্ত সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। "যাওয়া" ক্রিয়ার অবস্থান ভবিষ্যতে যে কোন অনির্দিষ্ট মুহূর্তে অর্থাৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্ত (moment of action) বিবৃতিমুহূর্ত (moment of speech) থেকে যে কোন দূরত্বে হতে পারে। এরপর ''যাওয়া'' ক্রিয়ার প্রয়োগ একবার তবে তার কালরূপ সাধারণ বর্তমান। এই সাধারণ বর্তমান চিরন্তন সত্য বা নিয়মিত অনুষ্ঠিত ঘটনা নির্দেশ করে না, এই কালরূপের প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে উল্লিখিত একক ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তটি বিবৃতিমুহূর্তের অতি নিকটে। বহুপ্রতীক্ষিত সেই শুভলগ্ন নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে --- একই ''যাওয়া'' ক্রিয়ার জন্য দুটি কালরূপের প্রয়োগে সেই অনুভূতির সঞ্চার হয়। অন্যভাবে বলা যায় গানের শুরুতে অভিব্যক্ত আশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। এরপর সাগরের উক্তিতে একটি ভিন্ন ক্রিয়া 'মেলা' --- তবে পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে এর যোগসূত্রটি ধরা কঠিন নয়। মেঘ ও রাতের বিদায়ে তটরেখা দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এবার ক্রিয়াপদের কালরূপ পুরাঘটিত বর্তমান। অর্থাৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্ত অতীতে বা বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে। মেঘ ও রাতের আশ্বাসবাণীর রূপায়ণ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। সাগরের উক্তির পূর্বেই সমস্ত প্রতীক্ষার অবসান ঘটে গেছে। এযাবৎ প্রযুক্ত ক্রিয়াসমূহের কালরূপ এবং সেই অনুসারে বিবৃতিমুহূর্তর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্তের অবস্থান এইভাবে চিত্রাকারে তুলে ধরা যায়।

ক্রিয়াপদ	কালরূপ	বিবৃতি মুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান মুহূর্তের কালগত অবস্থান
যাওয়া	সাধারণ ভবিষ্যৎ	পরে কোন অনির্দিষ্ট মুহূর্ত
যাওয়া	সাধারণ বর্তমান	অব্যবহিত পরে
মেলা	পুরাঘটিত বর্তমান	পূর্বে

ডানদিকের অংশের স্তম্ভাকার পাঠে দেখা যায় ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে একটি গতিরেখা। বহুপ্রতীক্ষিত সেই শুভক্ষণটি অনাগত ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমান মুহূর্ত অতিক্রম করে বিগত অতীতে বিলীন হয়ে যায়। তবে শেষে ব্যবহৃত পুরাঘটিত বর্তমান অতীতের সঙ্গে একটা সেতুবন্ধন রচনা করে। আঁধারের বিদায়ের মুহূর্তটি অতীত, এখন আলোকোজ্জ্বল এক নূতন পর্ব সমাগত। মেঘ, রাত ও সাগরকে নৈসর্গিক পটভূমি না ভেবে যদি তার উপর প্রতীকী তাৎপর্য আরোপ করি তাহলে স্থায়ীর ব্যাখ্যা এই হয় যে নিদারুণ দুঃখযন্ত্রনার এক দীর্ঘ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এখন সুদিন আগত, সুখসমৃদ্ধির অন্য এক পর্বের উন্মেষ ঘটেছে।

গানের মর্মবস্তুর এই নির্মাণপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি দ্বিতীয় কলির প্রথমার্ধ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। ওই কলিতে সাগরের ঘোষণার দ্বিতীয়ার্ধে এসে কিন্তু থমকে যেতে হয়। 'আমি তো আর নাই' --- সাগরযাত্রার শেষে সাগর নিজের অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘোষণা করে। দুঃযন্ত্রণার অবসানের চিত্রায়ণে মেঘ ও রাতের বিদায় অথবা সাগরযাত্রার সমাপ্তির প্রতীকের ব্যবহার চিরাচরিত কিন্তু সাগরের অস্তিত্বের বিলুপ্তির রূপকটি অভিনব। মেঘ ও রাতের বিদায় প্রকৃতির বিধানেই ঘটে কিন্তু সাগরের অস্তিত্বলোপের রূপকটির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সাগরকে দুঃখসাগর বা মারের সাগর যাই ভাবা হোক সেই সাগরকে অতিক্রম করলে তার অস্তিত্ব লোপ পাবে কেন? এই বিলুপ্তির তাৎপর্য যদি এইভাবেই ব্যাখ্যা করা হয় যে অতীতের সেই দুঃখযন্ত্রণার বিস্তার ছিল

সাগরের মত এবং বর্তমান সুখসৌভাগ্যের পর্বে আর তার লেশমাত্র নেই, তাহলে পরবর্তী অন্তরা অংশের শুরুতেই এই ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে। মেঘ, রাত এমনকী সাগরও বিদায় নিল অথচ দুঃখ বিদায় নিল না, সে চিরস্থায়ী হয়ে রইল। পূর্বোক্ত ত্রয়ীর সঙ্গে দুঃখের উক্তির ভাববস্তুর বিরোধ সুস্পষ্ট। সুতরাং দুঃখের অবসানের প্রতীকরূপে মেঘ, রাত ও সাগরের বিদায়ের ব্যাখ্যা আর গ্রহণযোগ্য থাকে না ; এবার তাই পুনর্মূল্যায়ণের প্রয়োজন।

সাগরের উক্তি ও সকলের সঙ্গে অসম্পৃক্ত ''আমি''র উক্তির মধ্যে একটা প্রতিসাম্য লক্ষ্য করা যায়। এই গানে আর সব উক্তিকারীর উক্তিই যখন একটিমাত্র বাক্যে গঠিত তখন দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র সাগর ও আমির ক্ষেত্রেই উক্তির গঠক বাক্যের সংখ্যা দুই ।

কূল মিলেছে আমি তো আর নাই
মিলাই আমি আর কিছু না চাই

বাক্যের সংখ্যাতেই নয়, বাক্যের প্রকৃতিতেও এই দুই উক্তির মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমে সদর্থক বাক্য, তারপর নঞর্থক বাক্য। গানের প্রথম অংশের প্রত্যেকটি উক্তিবাক্যে ক্রিয়া উত্তমপুরুষে হলেও কেবলমাত্র উপরোক্ত দুটি উক্তিবাক্যেই উত্তমপুরুষ সর্বনাম কর্তা "আমি"র সুস্পষ্ট উপস্থিতি; বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে কর্তা "আমি" উহ্য। শুধুমাত্র রূপগত ঐক্যই নয়, মর্মবস্তুর স্তরেও ঐক্য ধরা পড়ে। "আমি"র উক্তির প্রথমার্ধে আছে অস্তিত্বের বিলুপ্তি, দ্বিতীয়ার্ধে বাসনার নিবৃত্তি। আমি বিলীন হয়ে যায় --- এই অংশে বিলুপ্তিদ্যোতক "মিলানো'' ক্রিয়ার ব্যবহার। প্রাথমিক পাঠেই দেখা যায় সাগরের উক্তির দ্বিতীয়ার্ধেও আছে অস্তিত্বের বিলুপ্তি --- এই অংশের ক্রিয়া অনস্তিত্বদ্যোতক "নাই"। সাগরের উক্তির অবশিষ্ট অংশের কথাবস্তুকে "আমি"র উক্তির পরবর্তী অংশের কথাবস্তুকে মেলানো আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব নয়। কিন্তু গভীরতর পাঠের পর বলা চলে সাগরের এই উক্তির এই অংশেও নিহিত রয়েছে বাসনাপূরণের ব্যঞ্জনা --- ভিন্নতর অর্থে। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর যখন সৈকতরেখা দৃষ্টিগোচর হয় গ্লানিভারাক্রান্ত সাগরযাত্রীর বাসনা তখন পূর্ণ হয়। এই অংশে বাসনাদ্যোতক কোন ক্রিয়া না থাকলেও সমগ্র বাক্যটির মধ্য দিয়ে বাসনার চরিতার্থতা অভিব্যক্ত হয়েছে। চিত্রাকারে সমগ্র বিষয়টি এইভাবে উপস্থাপনা করা যেতে পারে :

	সদর্থক বাক্য	নঞর্থক বাক্য
সাগর	বাসনা পূরণ	অস্তিত্বের বিলুপ্তি
আমি	অস্তিত্বের বিলুপ্তি	বাসনা পূরণ

দুই উক্তির ঐক্যসত্ত্বেও উপস্থাপনার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সাগরের উক্তিতে প্রথমে বাসনার নিবৃত্তি ,তারপর অস্তিত্বের অবলুপ্তি। "আমি"র উক্তিতে প্রথমে অস্তিত্বের অবলুপ্তি, তারপর বাসনার নিবৃত্তি। এছাড়াও পদক্রমের ক্ষেত্রে সাগরের উক্তিতে অনুসৃত হয়েছে গদ্যরীতি : প্রথম বাক্যে কর্মের পর ক্রিয়া, দ্বিতীয় বাক্যে শুরুতে কর্তা শেষে ক্রিয়া। আমির উক্তিতে পদ্যরীতি অনুসৃত : প্রথম বাক্যে কর্তার পূর্বে ক্রিয়ার অবস্থান, দ্বিতীয় বাক্যে ক্রিয়ার পূর্বে "না"র অবস্থান।

এই সমান্তরালতার আলোকে আমরা সাগর ও "আমি"র উক্তির তাৎপর্য একত্রে বিশ্লেষণ করব। কূলের দেখা পাওয়ায় সাগরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না , বিলুপ্ত হয় "অকূল" সাগরের অস্তিত্ব। সাগরের বর্ণনায় "অকূল" "অনন্ত" "অসীম" এই বিশেষণগুলি বহুব্যবহৃত। সাগরকে অসীমের প্রতীক বলে ভাবা যায়। "কূল মেলা" সীমার বন্ধনে অসীমের ধরা পড়ার ব্যঞ্জনাবাহী। এই বক্তব্যের আলোকে আমরা "আমি"কে ক্ষুদ্র সীমার প্রতীক বলে ধরে নিতে পারি। সীমা তার সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অসীম অনন্তে বিলীন হয়ে যায়। উভয়ের উক্তিতে আছে অস্তিত্বের বিলুপ্তি এবং বাসনার চরিতার্থতা। আপন অস্তিত্ব বিলুপ্তিতেই বাসনা পূর্ণ হয়।প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বের অবলুপ্তি এক নবতর অস্তিত্বে উত্তরণ। সীমার রূপান্তর অসীমে, অসীমের সীমায়।

গানের প্রথমার্ধের শেষ বাক্যে "বলা" ক্রিয়ার রূপটি পর্যালোচনাযোগ্য। আর সমস্ত বাক্যের মত এই বাক্যেও "বলা" ক্রিয়ার প্রথমপুরুষের রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে ; কিন্তু কর্তা এক্ষেত্রে উত্তমপুরুষ সর্বনাম। এই ব্যাকরণগত অসঙ্গতি গানের মর্মবস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। নূতন রূপপ্রাপ্ত এই "আমি"র জন্য স্বতন্ত্র কোন ক্রিয়ারূপ থাকে না; মেঘ, রাত, সাগর, দুঃখ, ভুবন, গগন, প্রেম, মরণের মত এই "আমি"ও "বলে"। ক্ষুদ্র চেতনার সীমা অতিক্রম করে অনন্ত নিখিলের সঙ্গে একাত্ম "আমি" ও "সে"র মধ্যে আর কোন ব্যবধান থাকে না --- এ যেন সোহম তত্ত্বের কাব্যিক প্রয়োগ। এই গানটি সম্বন্ধে অধ্যাপক সুকুমার সেনের বিশ্লেষণটি প্রাসঙ্গিক :

> "জগৎ হচ্ছে খণ্ড অখণ্ড প্রাণের বিচ্ছেদ-মিলনের লীলাখেলা। এতেই আনন্দের স্ফুরণ হয়। সৃষ্টির পর থেকেই খণ্ডপ্রাণ চলেছে অখণ্ড প্রাণের সঙ্গে মিলনের অভিসারে অথবা বরযাত্রায়। অভিসারের পথে তার পদে পদে সংশয় ভয় দুঃখ কষ্ট। কিন্তু সে সব বিপদজাল কাটিয়ে উঠে একদিন সে স্বয়ম্বর বা বিবাহ সভায় পৌঁছবেই। তার দুঃসহ দুর্গম অভিসার একদিন সাড়ম্বর বরযাত্রায় পরিণত হবেই। এই মহৎ কবিকল্পনা এক এপিক ছবিপরম্পরায় রূপ পেয়েছে একটি গানে (...)। অপার সমুদ্রে নায়ক (জীবসত্ত্ব) পাড়ি দিয়েছে একলা নায়ে। অন্ধকার রাত্রি, আকাশে মেঘের আড়ম্বর। এই দুঃস্বপ্নের দুঃসাহসের মধ্যে হঠাৎ আশ্বাস এল। তাই নিয়ে গানের আরম্ভ।" [২]

আমাদের বিশ্লেষণে গানের এই স্থায়ী অংশ সাগরযাত্রার আখ্যান নয়। সীমার মিলনাকাঙ্ক্ষী অসীমের প্রতীক এই সাগর যাত্রাপথ নয়, সে স্বয়ং যাত্রী। সাগরের উক্তির প্রথমার্ধে প্রকৃতপক্ষে সাগরের উক্তি নয়, কূলের সন্ধানরত সাগরযাত্রীর উক্তি সাগরের কণ্ঠে। যাত্রাপথ আর যাত্রী এখানে একাত্ম হয়ে গেছে --- এই যাত্রা স্থানান্তরগমন নয়, এই যাত্রা এক অন্তর্যাত্রা। এই যাত্রা

আপন স্বরূপ উপলব্ধির সাধনা, আপন সত্তার গহন গভীরে অবতরণের সাধনা, আপন সীমা অতিক্রমণের সাধনা। এই যাত্রাতেই সামিল সীমার প্রতীক "আমি"।

জগৎকে খণ্ড ও অখণ্ড প্রাণের বিচ্ছেদ-মিলনের লীলাখেলারূপে ব্যাখ্যার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করি। তবে খণ্ডপ্রাণের অভিসারযাত্রা সম্বন্ধে অধ্যাপক সুকুমার সেনের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একটি সংযোজন করব। এই অভিসারযাত্রার গতি একমুখী নয়, শুধুই অখণ্ডপ্রাণের উদ্দেশ্যে খণ্ডপ্রাণের যাত্রা নয়, অখণ্ডপ্রাণও খণ্ডপ্রাণের অভিসারে যাত্রা করে। সীমা-অসীম, ক্ষুদ্র-ভূমা, খণ্ডপ্রাণ-অখণ্ডপ্রাণ --- যে নামেই এই যুগলকে অভিহিত করা হোক না কেন, এই আকর্ষণ পারস্পরিক , দুজনেরই সাধনা অপরকে পাওয়ার। আমাদের এই বক্তব্য সীমা অসীমের মিলন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধে, নাটকে, কবিতায়, গানে প্রকাশিত রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা তেমন কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরব।

সীমা অসীমের পারস্পরিক মিলনাকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি "উৎসর্গ" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ১৭নং কবিতায় :

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা। [৩]

কাব্যের পর প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে। উদ্ধৃত অংশে একই ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়।

> আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি, উভয়ের উভয়কে নহিলে নয়।[৪]

সীমা অসীমের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই । দুইয়ের মধ্যে বিভাজনরেখা কখন অবলুপ্ত হয়ে যায়। দুইয়ের মধ্যে নিরন্তর এক রূপান্তরের খেলা চলে। "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নাটকে সন্ন্যাসী সেই সত্য উপলব্ধি করে :

অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা-কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অনন্ত সকলি। [৫]

একই ভাবনার প্রকাশ এই প্রবন্ধের উদ্ধৃত অংশে :

> আমরা ভাষায় যাকে বলি সীমা সেই সীমা ঐকান্তিকরূপে কোথাও নেই,তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম সেই অসীমও ঐকান্তিক ভাবে কোথাও নেই, তাই অসীম কেবলই সীমায় রূপগ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন। [৬]

সীমা অসীমের মিলন কবির ভাবনার কতখানি জুড়ে তার প্রমাণ আমরা পাই "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে, তাঁরই "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নাটক বিষয়ে তাঁর মন্তব্য থেকে :

> আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে , সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনার পালা। [৭]

এই গানে দুঃখের ভূমিকা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব। এই বিষয়ে অধ্যাপক সুকুমার সেনের মন্তব্য :

> এইখানে বলে দিই রবীন্দ্রনাথের গভীর পুরাণজ্ঞান ও পুরাণবোধ। দুঃখ পায়ের চিহ্নরূপে চিরস্থায়ী হল, এই allusion-টি অনেক পণ্ডিতেও চট করে বুঝতে পারবেন না। পুরাণে একটি গল্প আছে। [৮]

এরপর অধ্যাপক সেন বিষ্ণুবক্ষে ভৃগুর পদচিহ্নের আখ্যানটি সবিস্তারে বিবৃত করেছেন : ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয়ের জন্য মুনিদের ভৃগুকে প্রেরণ, প্রথমে ব্রহ্মা তারপর শিবের আলয়ে ভৃগুর গমন, ভৃগুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে তাঁদের ব্যর্থতা, অবশেষে বিষ্ণুর আলয়ে গমন, অতিথি সৎকার না করায় ক্রুদ্ধ ভৃগুর বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত, বিষ্ণুর ক্ষমাপ্রার্থনা, তিন দেবতার মধ্যে ভৃগুর বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা। এখানে আমরা অধ্যাপক সেনের আলোচনার শেষ বাক্যটির উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> বিষ্ণুর বুকে ভৃগুর পদাঘাত অক্ষয় হয়ে রইল শ্রীবৎসলাঞ্ছন বা কৌস্তুভমণিরূপে। [৯]

এই গানের অন্তরা অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক সুকুমার সেন কেন বহুশ্রুত ওই পৌরাণিক কাহিনির (যা তাঁর মতে অনেক পণ্ডিতের অজানা) অবতারণা করলেন তা আমদের বোধগম্য হয় নি। "তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে" দুঃখের অবস্থিতির মধ্যে আমরা বিষ্ণুবক্ষে অঙ্কিত ভৃগুর পদচিহ্নের আখ্যানের কোন ছায়া খুঁজে পাই নি। পরবর্তীকালে গবেষকরা এইবিষয়ে চিন্তাভবনা করতে পারেন। আমরা কোন পৌরাণিক কাহিনির আলোকে নয়, দুঃখকে ঘিরে রবীন্দ্রভাবনার আলোকেই এই অংশের বিশ্লেষণ করব।

স্তম্ভাকার পাঠে দেখা যাচ্ছে দুঃখের অবস্থান "সাগর'' ও "আমি''র মাঝখানে :

সাগর
দুঃখ
আমি

যে মহামিলনের ব্যঞ্জনা মিলনাকাঙ্ক্ষী "সাগর" ও "আমি"র উক্তিতে নিহিত, দুঃখ সেই মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করে। মিলনের এই দুরতিক্রম্য পথ দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনার পথ, এই দুরূহ সাধনার পথ কঠিন দুঃখের দুর্গম পথ। মিলনস্বর্গে উত্তরণের সোপানরূপে দুঃখের অনুরূপ চিত্রায়ণ আমরা দেখি এই গানটিতে :

এই-যে কালো মাটির বাসা শ্যামল সুখের ধরা---
এইখানেতে আঁধার-আলোয় স্বপন-মাঝে চরা।।
(.....)
দুঃখে যখন মিলন হবে আনন্দলোক চিনবে তবে
সুধায়-সুধায় ভরা। [১০]

আমরা দেখেছি এই মিলনসাধনা আত্মোপলব্ধিরও সাধনা। আত্মজ্ঞান উন্মেষের সেই সাধনা যে কঠোর দুঃখের সাধনা তার সুস্পষ্ট উল্লেখ "রূপ-নারানের কূলে" কবিতায় :

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ---
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ; [১১]

রবীন্দ্রমানসে সমগ্র জীবনই এক দুঃখের তপশ্চর্যা, দুঃখ সত্যে উত্তরণের সেতু ;ওই কবিতাতেই সেই ভাবনার বহিঃপ্রকাশ :

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন---
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে, [১২]

সেই সাধনার অবসানে, বহুপ্রতীক্ষিত সেই শুভমুহূর্তেও দুঃখের বিদায় না নেওয়াকে নৈরাশ্যবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বলে ভাবলে ভুল হবে। দুঃখের এমন অবস্থানের তাৎপর্য এই নয় যে অপূর্ণতার হাহাকার কোনদিনই ঘোচে না, নিবিড় মিলনের ক্ষণেও না পাওয়ার বেদনা চির জাগরূক থাকে। দুঃখের আত্মপ্রকাশ ঘটে নূতনতর রূপে --- "তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে"। সর্বনামের প্রথমপুরুষের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এই গানে এই একটিই পাওয়া যায় ; এই সর্বনাম কোন বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে এই গানের কোথাও তার উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনার কথাই মনে আসে --- সম্ভ্রমসূচক সর্বনাম ঈশ্বরকে নির্দেশ করছে। যে দুঃখের দহনে হৃদয়প্রাণ পরিশুদ্ধ হয় তা দয়াময় ঈশ্বরের দয়ার দান। কঠোর তপশ্চর্যার মধ্য দিয়ে তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়। তাই সাধনার অন্তে দুঃখ বিদায় নেয় না । দুঃখ ভক্তের প্রতি মিলনপিয়াসী ভগবানের পরম দান --- এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথের বহু গানে আরও অনেক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তেমন একটি দৃষ্টান্ত আমরা পাই পরবর্তী গানটির অন্তরা অংশে :

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো !
(.....)
নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান । [১৩]

আলোচ্য অংশের সঙ্গে পরবর্তী গানটির মর্মবস্তুগত একটা সমান্তরালতা চোখে পড়ে :

এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল যে, পার হল।
তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে, সকল সুখের সার হল ।। [১৪]

উদ্ধৃত অংশে আমাদের আলোচ্য গানের মতই দুঃখের স্বরূপ উদ্ঘাটনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাগর পাড়ি ও চরণের অনুষঙ্গ। দীর্ঘ সাধনার প্রতীক সাগরযাত্রার অবসানে তাঁর চরণপরশে দুঃখ পর্যবসিত হয় চরম সুখে। আমাদের আলোচ্য গানটিতেও চেতনার সেই স্তরে উত্তরণ ঘটে যেখানে সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার মধ্যবর্তী সব বিভাজনরেখা অবলুপ্ত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গানের মত এখানে দুঃখের সুখে রূপান্তর দেখি না, কিন্তু একই অনুভূতির ভিন্নতর বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। সাংসারিক বাস্তবচেতনায় যা প্রতীয়মান হয় অপ্রিয়, অবাঞ্ছিত রূপে, সেই দুঃখই বরণীয় হয়ে ওঠে --- সে বিদায় নেয় না।

এই চরণচিহ্নের রূপকল্পের ঈষৎ ভিন্ন পাঠ সম্ভব। এই পাঠে পায়ের চিহ্নের উপর কোন প্রতীকী তাৎপর্য আরোপ করা হয় নি। যার চরণচিহ্ন মুদ্রিত হয়ে আছে, সেই ঈশ্বরই স্বয়ং অভিসারযাত্রী। তিনি সর্বশক্তিমান, নিখিল বিশ্বচরাচরের তিনি প্রভু, তবু তিনি যে প্রেমের কাঙাল। ভক্তপ্রাণের প্রেম না পেলে মহিমাময়ের মহিমা যে পূর্ণ হয় না। তাই তো ত্রিভুবনেশ্বরকে বারবার নীচে নামতে হয়, অসীমপ্রতাপ রাজাধিরাজ বারবার সর্বরিক্ত আকিঞ্চন ভিখারির বেশে তিনি এসে দাঁড়ান প্রেম ভিক্ষা চাইতে। ভক্তের মন পেতে কত না মনোহরণ বেশে তার নিত্য বিচরণ! কিন্তু মোহ আঁধারে নিমগ্ন প্রাণ তাঁর আবির্ভাব অনুভব করতে পারে না। বিফলমনোরথ হয়ে তিনি ফিরে যান। অনন্ত অনাদিকাল ধরে তাঁর আসা যাওয়া। সেই অভিসারযাত্রাপথে মুদ্রিত হয়ে থাকে তাঁর চরণরেখা। তাঁর চরণপাতে বেজে ওঠে ব্যর্থ অভিসারের হাহাকার, ভক্তকে না পাওয়ার বেদনা। অবশেষে মোহ অন্ধকারের অবসানে যখন দীর্ঘ যাত্রাপথ জুড়ে তাঁর পদরেখা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখনই ভক্তহৃদয় অনুভব করে :

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে [১৫]

আমরা দেখেছি জীবনের দুঃখবেদনার পর্বকে চিত্রায়িত করতে কবি মেঘ ও রাতের চিরাচরিত রূপক ব্যবহার করেন নি। মেঘ ও রাতের বিদায় জাগতিক সুখসমৃদ্ধির সূচনার প্রতীক নয়। মেঘ ও রাতের অন্ধকার অজ্ঞানতার, অবিদ্যার প্রতীক --- যা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ইন্দ্রিয়চেতনায় জীবন ও জগতের যে রূপ প্রতিভাত হয় তা সত্যের খণ্ডিত রূপ মাত্র। মোহ আবরণ ছিন্ন করে যখন পূর্ণজ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত হয় তখনই ইন্দ্রিয়চেতনার অন্তরালস্থিত সত্যের প্রকাশ ঘটে অখণ্ড রূপে। গানের শুরুতে দেখা যায় অন্ধকারের যবনিকা উত্তোলনের মুহূর্তটি সমাগতপ্রায়। এই অপসৃয়মান অন্ধকার পূর্ণচেতনার জাগরণের সূচনাপর্বের সঙ্কেতবাহী।

উক্তিবাক্যে মধ্যমপুরুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গানের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ও দ্বিতীয় পর্বের শুরু। আমরা দেখেছি এই অংশের প্রতিটি উক্তিবাক্যে মধ্যমপুরুষের উপস্থিতি। প্রশ্ন ছিল কার বা কাদের উদ্দেশে এই সম্ভাষণ। সমগ্র গানটির কোথাও এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। আমাদের উত্তর --- একটি সম্ভাব্য উত্তর --- এই সম্ভাষণ গানের কেন্দ্রস্থলে যার অবস্থান সেই "আমি"র উদ্দেশে --- ক্ষুদ্র চেতনার বন্ধন থেকে মুক্ত অসীম, অনন্তে বিলীন "আমি"। সেই ক্ষুদ্র "আমি"কে যে মোহ, যে অজ্ঞানতা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তার অবসানে সেই ক্ষুদ্র প্রাণে আসে অখণ্ডপ্রাণের বার্তা। ভুবন, গগন, প্রেম, মরণ --- বহুকণ্ঠের সম্ভাষণে বেজে ওঠে অনন্ত নিখিলের মর্মবাণী।

এই অংশের উক্তিবাক্যগুলিতে মধ্যমপুরুষের পর উত্তমপুরুষের প্রয়োগও পর্যালোচনাযোগ্য। প্রতিটি বাক্যে মধ্যমপুরুষ উপস্থিত থাকলেও উত্তমপুরুষের ব্যবহার কেবলমাত্র প্রেম ও মরণের উক্তিতে। গগন ও ভুবনের উক্তিতে উত্তমপুরুষের অনুপস্থিতি তাদের ভূমিকার পার্থক্যের ইঙ্গিত বহন করে। দুটিবাক্যেরই ক্রিয়া "আছে" --- ক্রিয়াবিহীন দ্বিতীয় উক্তিবাক্যটিতে উহ্য "আছে" (তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা আছে)। "তোমার তরে" যা আছে গগন ও ভুবনের উক্তিতে তার বিবরণ। এখানে প্রেম বা মরণের মত ভুবন ও গগনের কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। তাদের ভূমিকা ঘোষকের বা বার্তাবহের।

যে মিলনের বাণীরূপায়ণ গানের প্রথম পর্বে , সেই মিলনের আনন্দ শুধুই মিলনপিয়াসীর নয়, সেই বিপুল আনন্দতরঙ্গ নিখিল ভুবন প্লাবিত করে দেয়। সেই উৎসবের আয়োজন দ্যুলোক, ভূলোক জুড়ে। ভুবন ও গগনের উক্তিতে তারই ঘোষণা : বরণডালা ও লক্ষ প্রদীপ এক আনন্দমুখর মহোৎসবের আবহ রচনা করে। অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় এই গানটিতে --- যেখানে মহামিলনের আনন্দ-আবেশ ছড়িয়ে থাকে আকাশে, ধরাতলে :

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে ফুল্ল শ্যামল ধরা ।।[১৬]

এই মহামিলনের সাধনার পথ দুঃখযন্ত্রণার দুর্গম, বন্ধুর পথ --- সেই কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু চালিকাশক্তি হল প্রেম। এই সাধনা প্রকৃতপক্ষে প্রেমের সাধনা। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি সীমার সঙ্গে অসীমের যোগকে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের যোগ বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রেম নরনারীর পারস্পরিক দেহমনের আকর্ষণ নয়, এই প্রেম বিশ্বপ্রেম, সুদূরতম নক্ষত্র থেকে ধরণীর প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু, পরমাণুতে সতত প্রবহমান। যে জ্ঞানের উন্মেষে দুঃখসুখের ভেদ ঘুচে যায় (আমরা আগেই দেখেছি) জীবনমৃত্যুর সীমানা অতিক্রম করা যায় (আমরা গানের শেষে দেখব) --- সেই জ্ঞান মননসঞ্জাত নয় --- তার উৎস প্রেম।

> আনন্দের জানা। প্রেমের জানা। এ হচ্ছে সমস্ত জানাকে লঙ্ঘন করে জানা। (...) প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে - তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই। [১৭]

সীমা অসীমের এই মহামিলনে প্রেমের অনুষঙ্গ ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের আর এই মন্তব্যে :

> মানুষ যখন জানিতে পারে সীমাতেই অসীম তখনি মানুষ বুঝিতে পারে এই রহস্যই প্রেমের রহস্য ; (...)। সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য, সীমাই অসীমের আনন্দ ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিতেছেন। [১৮]

প্রেমের সঙ্গে প্রতীক্ষার অনুষঙ্গ চিরন্তন। এই গানেও দেখি প্রতীক্ষা --- যুগযুগান্তব্যাপী প্রতীক্ষা --- কিন্তু এইক্ষেত্রে এই প্রতীক্ষা প্রণয়ী হৃদয়ের নয়, প্রতীক্ষারত স্বয়ং প্রেম। যুগ যুগ ধরে তার ব্যাকুল প্রতীক্ষা কবে মোহতিমিরে সুপ্তিজড়িমামগ্ন প্রাণ তার স্বরূপ উপলব্ধি করবে, উন্মেষ হবে পূর্ণজ্ঞানের--- প্রেম পূর্ণ হবে তখনই। প্রেমের মিলনের জন্য প্রস্তুতি চলে বহুযুগ ধরে।

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা।। [১৯]

প্রেমের এই উক্তিবাক্যে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পুরুষের রূপটি লক্ষণীয়। গানের প্রথমার্ধের প্রতিটি উক্তিবাক্যে ছিল শুধুই উত্তমপুরুষ, দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুটি উক্তিবাক্যে উপস্থিত শুধুই মধ্যমপুরুষ। প্রেমের উক্তিবাক্যেই প্রথম দেখা গেল উত্তম ও মধ্যমপুরুষের সহাবস্থান। উত্তমপুরুষের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কিন্তু ক্রিয়ারূপে, সর্বনামরূপে নয় ; সর্বনাম কর্তা "আমি" এই বাক্যে উহ্য। "আমি" র এই অনুপস্থিতিকে প্রেমের চরম আত্মনিবেদনের প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আপনার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে এক নূতনতর অস্তিত্বে উত্তরণেই প্রেমের পূর্ণতা। "আমি বলে মিলাই আমি"র মধ্যেও সেই ভাবনারই প্রতিফলন। আমার আমিত্ব এখানে অন্তরালে রয়ে যায়, সত্য হয়ে থাকে শুধু আমার যুগযুগান্তব্যাপী অতন্দ্র প্রতীক্ষা।

ব্যাকরণগত গঠনের স্তরে এই উক্তিতে দুটি অসঙ্গতি চোখে পড়ে । প্রথমত ক্রিয়াপদ 'বলে'র পর অব্যয় 'যে'র প্রয়োগ ঘটেছে । প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়ার পর এই অব্যয়ের প্রয়োগ ঘটে যখন অপ্রধান খণ্ডবাক্যটি পরোক্ষ উক্তিতে থাকে। অথচ অন্য

সব উক্তিবাক্যের মত এই উক্তিবাক্যটিও প্রত্যক্ষ উক্তি। 'যে' অব্যয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ উক্তির প্রয়োগ ব্যাকরণরীতিবিরুদ্ধ। দ্বিতীয় অসঙ্গতি উক্তিবাক্যে ব্যবহৃত যুগ্মশব্দ ও ক্রিয়ার প্রয়োগে। "যুগে যুগে" এবং "আছি জেগে"র সহাবস্থান ব্যাকরণরীতিসম্মত নয়। কালদ্যোতক "যুগে যুগে" শব্দগুচ্ছ কালের বিস্তার নয়, বিবর্তন নির্দেশ করে। এই শব্দগুচ্ছের সঙ্গে প্রয়োজন ঘটনানির্দেশক কোন ক্রিয়াপদ বা পদগুচ্ছ। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ "সম্ভবামি যুগে যুগে" --- ঈশ্বরের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের ঘটনা বারবার ঘটে, প্রতি যুগে ঘটে, তাই "যুগে যুগে" শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ বিধিসম্মত। অন্যদিকে " আছি জেগে" ক্রিয়াপদগুচ্ছ ঘটনা (event) নির্দেশ করে না, নির্দেশ করে অবস্থা (state) । জাগরণকে বারংবার অনুষ্ঠিত ঘটনারূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কালনির্দেশক "যুগ"এর বহুত্বের সঙ্গে জাগরণের ব্যাপ্তির কথাই শুধু ভাবা যায়। সেই ক্ষেত্রে ওই যুগ্মশব্দে বিভক্তিচিহ্ন বাদ দিয়ে একটি অব্যয় সংযোজন করা প্রয়োজন: "ধরে"। ব্যাকরণসম্মত প্রয়োগ হবে "যুগ যুগ ধরে জেগে আছি"।

ভাষারীতি লঙ্ঘনের একটি দৃষ্টান্ত আমরা ইতিমধ্যে চতুর্থ কলিতে পেয়েছি (আমি বলে মিলাই আমি)। তেমন দুটি দৃষ্টান্ত আমরা এই আলোচ্য কলিতে পেলাম। প্রেমের মায়ামন্ত্রবলে দুঃখ-সুখে মধ্যে, সীমা-অসীমের মধ্যে সব বিভেদ ঘুচে যায় ; প্রেম কোন শ্রেণিবিন্যাস মানে না। সেই প্রেমের চিত্রায়ণে এখানে ভাষাগত শ্রেণিকরণের (linguistic categorization) রীতি মানা হয় নি। যে নিয়ম একটি শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে তা এক ভিন্ন বা বিপরীত শ্রেণির জন্য প্রযুক্ত হচ্ছে। এমনি ভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, ক্রিয়ার কালগত ব্যাপ্তি ও পৌনঃপৌনিকতার মধ্যে কোন ভেদ থাকে না । প্রেমের উন্মেষে সব এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়।

চেতনার যে স্তরে উত্তরণ হলে সীমা অসীমের সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়, দুঃখ আর দুঃখের কূপ থাকে না, দুঃখ প্রতিভাত হয় সুখ রূপে, সেখানে মৃত্যু আর মৃত্যুর রূপ ধরে না, সেও নবতর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আপন স্বরূপ উন্মোচন করে জীবনতরণীর কাণ্ডারীরূপে। সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র-ভূমার মত জীবন-মৃত্যুর মধ্যে সব প্রাচীর চূর্ণ হয়ে যায়। একে অন্যের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। মৃত্যুর এমন চিত্রায়ণের সঙ্গে "ফাল্গুনী" নাটকের ভাববস্তুর একটা সমান্তরলতা লক্ষ্য করা যায়। খেলাপাগল যুবকের দল নূতন খেলার ছলে যে বুড়োকে ধরতে বেড়োয় শেষে দেখা যায় সেই বুড়ো আর কেউ নয় সে তাদেরই সর্দার --- চিরযৌবনের প্রতিমূর্তি। জরা দেখা দেয় ছদ্মবেশী যৌবনরপে। তেমনি এই গানে মৃত্যু ধরা দেয় জীবনের ছদ্মরূপে।

গভীরতর পাঠে শেষের কলিটির সঙ্গে গানের দ্বিতীয়ার্ধের বাকি অংশের একটা বৈপরীত্য ধরা পড়ে--- যা রবীন্দ্রভাবনায় মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হবে। গানের আভোগে প্রেমের অনন্ত জাগরণের পর আসে অনন্তনিদ্রারূপী মরণ। মরণ আসে সর্বশেষে , কিন্তু সে চির অবসানের বার্তা নিয়ে আসে না। প্রত্যাশা অনুসারে পরিপূর্ণ স্তব্ধতায় এই গানের সমাপ্তি ঘটে না। বরং আমরা দেখি দ্বিতীয়ার্ধে মৃত্যুর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত পরপর রূপকল্পগুলি স্থির নিশ্চল দৃশ্য, শেষে মৃত্যু রচনা করে এক গতিময়, চলিষ্ণু চিত্রকল্প। গানের এই অংশে পরপর তিনটি কলিতে অবস্থানদ্যোতক ক্রিয়া (আছে / আছি), তারপর শেষ কলিতে গতিদ্যোতক ক্রিয়া (বাওয়া)। গানের শেষ কথা "বাই" --- "বাওয়া" ক্রিয়ার উত্তমপুরুষের সাধারণ বর্তমানের রূপ। এর আগে সাধারণ বর্তমানের প্রয়োগ ঘটেছে মোট তেরবার। এর মধ্যে কোনক্ষেত্রেই কিন্তু ঘটনার নিয়মিত অনুষ্ঠান নির্দেশ করা হয় নি। পঞ্চম ও সপ্তম কলিতে ব্যবহৃত হয়েছে অবস্থান বা অস্তিত্বদ্যোতক ক্রিয়া (আছে /আছি), তৃতীয় কলিতে অনস্তিত্বদ্যোতক ক্রিয়া (নাই) , চতুর্থ কলিতে বাসনাদ্যোতক ক্রিয়ার নঞর্থক রূপ (না চাই) । "বাই" ক্রিয়ার আগে সাধারণ বর্তমানে ঘটনানির্দেশক ক্রিয়ার প্রয়োগের সংখ্যা নয় ---- সাতবার "বলা" ক্রিয়ার ব্যবহার, একবার করে "যাওয়া" এবং "মিলানো" ক্রিয়াদুটির ব্যবহার। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ একক ঘটনা নির্দেশ করা হয়েছে। ওই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণ বর্তমান ঘটমান বর্তমানেরই প্রতিরূপ --- "বলে", "যাই", "মিলাই" ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে "বলছে", "যাচ্ছি" এবং "মিলিয়ে যাচ্ছি"র স্থানে। গানের একেবারে শেষে প্রথমবারের জন্য আমরা দেখি একক ঘটনার পরিবর্তে নিয়মিত অনুষ্ঠিত ঘটনা। এই তরণী বাওয়া চিরদিনের। গানের শেষে অন্তহীন চলাচলের শুরু। স্থির নিশ্চল এক পরিমণ্ডলে চিরন্তন গতিময়তা সঞ্চার করে যে তার নাম মৃত্যু --- বাস্তব ইন্দ্রিয়চেতনায় যা চির অবসান।

মৃত্যুর ঘোষণা একটা বাড়তি তাৎপর্য লাভ করে উক্তিবাক্যে সর্বনামের ব্যবহারে। আমরা দেখেছি গানের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দুটি কলিতে উত্তমপুরুষ অনুপস্থিত, পরবর্তী কলিতে যদিও ক্রিয়ার উত্তমপুরুষের রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে উত্তমপুরুষ সর্বনাম কর্তা "আমি" উহ্য থেকে যায়। প্রথমার্ধের শেষ কলিতে "আমি" মিলিয়ে যায়, তারপর মরণের উক্তির আগে পর্যন্ত আর "আমি"র সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশেষে মরণের উক্তিতে "আমি"র পুনরাবির্ভাব : "আমি"র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মরণ তার সুস্পষ্ট উপস্থিতি ঘোষণা করে। উক্তিবাক্যে "আমি"র এই সুস্পষ্ট উপস্থিতি উক্তিকারীর বার্তায় দৃঢ়তা এনে দেয়। সে যেন বলে এই ভূমিকা অন্য কেউ নয়, শুধু সেই পালন করে --- জীবনপ্রবাহ অব্যাহত রাখে আর কেউ নয়, মৃত্যু।

আপাত চির অবসানের মধ্যেই চির প্রবহমানতা, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই অনন্ত জীবনপ্রবাহ। মৃত্যুর এই চিরকালের জীবনতরণী বাওয়ার রূপকল্পটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমরত্বে উত্তরণের প্রতীক। পূর্ণজ্ঞানের উন্মীলনে মৃত্যু সেই রূপেই ধরা দেয়। আলোচনার এই অংশে এই গানটি মনে আসে :

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।।
সময় যেন হয় রে এবার ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি।।[২০]

মৃত্যু ও অমরত্বের একই ভাবনা দুটি গানেই অভিব্যক্ত হয়েছে --- পার্থক্য উপস্থাপিত রূপকল্পের চরিত্রে। এই গানে এই রূপকল্পটি স্থির, নিশ্চল --- প্রযুক্ত "রওয়া" ক্রিয়াটি স্থিতিবোধক। আমাদের আলোচ্য গানে ব্যবহৃত চিত্রকল্পটি গতিময় ---

প্রযুক্ত "বাওয়া" ক্রিয়াটি গতিবোধক। আরও লক্ষণীয় দুটি গানেই তরণী বাওয়ার রূপকল্পটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু দুটি গানে তার তাৎপর্য ভিন্ন। আমাদের আলোচ্য গানে এই তরণী বাওয়া শাশ্বত জীবনের প্রতীক। অন্যদিকে উল্লিখিত এই গানে তরী বাওয়া প্রাথমিক পর্বের ব্যর্থ অন্বেষণের অনুষঙ্গবাহী। অরূপরতনসন্ধানী যে তরী ঘাটে ঘাটে বেয়ে চলে তা জীর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু মৃত্যুর বাওয়া তরণী অক্ষয়।

এই তরণীর চিত্রকল্প প্রয়োগের আর একটি তাৎপর্য ধরা পড়ে। গানের স্থায়ী অংশে আমরা দেখেছি সাগর তার অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছে । কিন্তু গানের শেষে এই তরণী বাওয়া সাগরের পুনরাবির্ভাবের সঙ্কেতবাহী। সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হলেও এই তরী বাওয়ার পটভূমি সাগর। আবার তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুভব করা যায়। অনস্তিত্ব থেকে গানের শেষে আবার অস্তিত্বে উত্তরণ ঘটে।

পূর্ববর্তী অংশে একাধিকবার বিপরীতের প্রয়োগের প্রসঙ্গ এসেছে। সেই আলোচনা দিয়ে আমরা এই নিবন্ধ শেষ করব। বিপরীতের প্রয়োগ রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি অন্যতম শৈলীগত বৈশিষ্ট্য। এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রমানসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়। জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আমরা আমাদের খণ্ডচেতনায় বিপরীত শ্রেণিতে বিভক্ত করি। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ, ভালো-মন্দ, আলো-আঁধার, জীবন-মৃত্যু --- এই সকল যুগলের মধ্যে প্রিয়-অপ্রিয়, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত, গ্রহণীয়-বর্জনীয়ের শ্রেণিবিন্যাস গড়ে তুলি। এই দুইয়ের মধ্যে আমরা একটি পক্ষ অবলম্বন করি, এক পক্ষের জয় কামনা করি, একপক্ষকে বিদায় দিয়ে অপর পক্ষকে আবাহন করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবনকে দেখেন তার পূর্ণতায়, তার অখণ্ডতায়। তাই সমস্ত বিপরীতের দ্বন্দ্ব কবির দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় জীবনের বৈচিত্র্যের পূর্ণতম বহিঃপ্রকাশ রূপে। আপাতবিপরীতের মধ্যে অন্তর্লীন ঐক্য কবির দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কোন কিছুই তাঁর কাছে বর্জনীয় নয়; সব কিছুর মধ্যেই তিনি তাঁর সৃষ্টির উপাদান খুঁজে পান। তাই রবীন্দ্রনাথের বহু গানেই বিপ্রতীপের সহাবস্থান --- আনন্দ-বেদনা, সুন্দর-অসুন্দর, বিরহ-মিলন, জীবন-মরণ সব একই সূত্রে গ্রথিত হয়। এমন প্রয়োগের প্র কৃষ্টতম উদাহরণ বিচিত্র পর্যায়ের এই গানটি । এই গানের প্রতিটি কলিতে বিপরীতের সহাবস্থান।

দুই হাতে ---
কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে,
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে ।।
বাজে ফুলে, বাজে কাঁটায়, আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ওই-যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে।।
তালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই ছন্দে নানান রঙ জাগে
এই তালে তোর গান বেঁধে নে ----কান্নাহসির তান সেধে নে
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন, নাচন-সভার ডঙ্কাতে।।[২১]

অধ্যাপক পবিত্র সরকার একটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গানে বিপরীতের প্রয়োগ নিয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন।

> সুখ-দু:খ , সুন্দর-কুৎসিত, , অন্তর-বাহির, ভয়ঙ্কর-কল্যাণকর, জীবন-মরণ, রূপ-অরূপ, স্থিতি-গতি, নতুন-পুরোনো, (যৌবন-বার্ধক্য)এইসব বিরোধ-সদস্যদের মধ্যে একটা অভিজ্ঞতা আমাদের সাংসারিক চোখে নেতিবাচক, আমরা সেটাকে এড়াতে চাই. আর একটা অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে ইতিবাচক, আমরা তাকে বেশি করে পেতে বা গ্রহণ করতে চাই। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ওই বিরোধী যুগ্মক আমাদের উপলব্ধি বা প্রতিক্রিয়াকেও দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলে। তার মধ্যেও একটা বিরোধ সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথ এই বিরোধকে আমাদের মতো দেখেন না, তিনি দুয়ের মধ্যে একটা গূঢ়তর সংগতি দেখতে এবং দুয়ের অনোন্য পরিপ্রেক্ষিতটি দেখিয়ে তাদের একটা বৃহত্তর অস্তিত্বের অঙ্গ বলে দেখান - যেখানে তাঁর কাছে দুই-ই স্বাভাবিক ও সংগত। (...)এই বিরোধগুলি দেখান রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত হল যে, এগুলি আসলে আপাতবিরোধ, অভিজ্ঞতা বা ভাবনার উপরিতলে এগুলিকে পরস্পরের বিপরীত বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে কোন বিরোধ নেই। [২২]

অধ্যাপক সরকার বহু রবীন্দ্রসঙ্গীতের উদাহরণ সহযোগে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি এই নিবন্ধের এক অংশে জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব নিরসন ঘটেছে এমন গানের উদাহরণ দিয়েছেন ; ওই সমস্ত গানের এক বা একাধিক কলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই অংশে আমাদের অলোচ্য গানটির উল্লেখ রয়েছে। তবে সমগ্র গানটি তাঁর আলোচ্য নয়, তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে তিনি এই গানের শেষ কলিটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এই গানের শেষ কলিটি নিঃসন্দেহে বিপরীতের দ্বন্দ্বের আবসানের এবং রূপান্তরের খেলার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু শেষ কলিতে স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট ভাষায় যা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা আভাসে, সঙ্কেতে ব্যক্ত করা হয়েছে গানের পূর্ববর্তী অংশের নানা স্থানে --- প্রাথমিক পাঠে যা ধরা পড়ে না। আমরা দেখেছি দু;খের সুখে রূপান্তর, সীমার অসীমে, অসীমের সীমায় রূপান্তর। কিন্তু গানের কোথাও কিন্তু "সুখ" শব্দটি বা তার কোন প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয় নি ; একইভাবে সীমা বা অসীম দুটি শব্দের কোনটিই বা তাদের কোন প্রতিশব্দই কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। গানের শেষ কলি পর্যন্ত দুই বিপরীতের মধ্যে যে অন্তর্লীন ঐক্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে অতিসূক্ষ্মভাবে --- গানের শেষ কলিতে সুস্পষ্টভাবে সেই ঐক্য নির্দেশ করা হয়েছে দুই চরম বিপরীতের মধ্যে : মরণ ও জীবন। গানে এই প্রথম আমরা দেখলাম একই কলিতে বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ দেখলাম। না বলা বাণীর ঘন যামিনীর

মাঝে যে ভাবনা তারার ক্ষীণ দীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে প্রায় সম্পূর্ণ গানে , শেষের কলিতে তা রাত্রিশেষে দিবালোকের মত সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।

উল্লেখপঞ্জী

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ২৩৩

২) সেন, সুকুমার : রবীন্দ্রনাথের গান, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮২, পৃ ৪২-৪৩

৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : উৎসর্গ ১৭, রবীন্দ্ররচনাবলী পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ,২০১৩, পৃ ৯৪

৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সীমা ও অসীমতা,পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ২০১৩,পৃ ৬৯৫

৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্ররচনাবলী পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ,২০১৩, পৃ ৩৮২

৬) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : একটি মন্ত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ,২০১৩,৬৬৬

৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : প্রকৃতির প্রতিশোধ, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৫০০

৮) সেন, সুকুমার : রবীন্দ্রনাথের গান, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮২, পৃ ৪৩

৯) তদেব : পৃ ৪৪

১০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৯৩-৯৪

১১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনা :শেষ লেখা ১১ রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ,২০১৩,পৃ ১২২

১২) তদেব : পৃ ১২২

১৩) অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৫৯

১৪) তদেব : পৃ ৮৮

১৫) তদেব : পৃ ৫৯

১৬) তদেব : পৃ ১৯

১৭) ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ : সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্ররচনাবলী সপ্তম খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ২০১৩,পৃ ৫৩৬

১৮) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : সীমা ও অসীমতা,পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ২০১৩,পৃ ৬৯৫

১৯) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ১৯

২০) তদেব : পৃ ২৩৮

২১) তদেব : পৃ ৫৪৫

২২) সরকার, পবিত্র : দ্বন্দ্ববিরোধ : রবীন্দ্রসংগীতের এক সৃজনভিত্তি, গানের ঝরনাতলায়, কলিকাতা, প্রতিভাস, ২০১৩ পৃ ১২৭-১২৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

খাতুন, সনজীদা : রবীন্দ্রসঙ্গীত মননে লালনে, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১১

চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩

দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী, কলিকাতা, গ্রন্থনিলয়, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩

রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী,১৯৮০

রায়, আলপনা (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১

*****